Subject : Bengali
Ph.D Course Work
Paper : III (Bangla Sahityacharcha)
Paper No. : BNG 103
Unit : IV (Sahitya Shrishtite Artha-Samajik O Rajnoitik Prekshit)
Topic : Joruri Obostha O Biponno Gonotontro (1975-77) : Nirbachito Bangla Sahitya

জরুরি অবস্থা ও বিপন্ন গণতন্ত্র (১৯৭৫-৭৭): নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য

মহর্ষি সরকার

> ...নদী বলতে শুধু মুক্ত জলধারাকেই বোঝায় না, দুদিকের সেই পাড়দুটিকেও বোঝায়, জলধারাকে যা বেঁধে রেখেছে। পাড় যদি না থাকত নদীর অস্তিত্বই থাকত না যে। আজ আমার মনে হয় যে, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল, তা দেওয়া হয়নি। দেশে যে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল এটা তার একটা কারণ তো বটেই।[১]

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর (১৯১৭-১৯৮৪) এই স্মৃতিচারণ কতটা যুক্তিসঙ্গত তা আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত জানতে পারব। তবে একথা ঠিক যে, সাতের দশকে ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-এর ২৬ জুন) ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘ ২১ মাস ধরে চলতে থাকা এই জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নিয়েছিল। গ্রেপ্তার ও অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে দেশের সাধারণ মানুষকে এই জরুরি অবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এইভাবে এক বিরাট ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ পেয়েছিল সেই সময়।

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-১৯৭৭) বাংলা সাহিত্য জগতে এক বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। নিষিদ্ধ করা হয়েছিল অনেকগুলি পত্র- পত্রিকা। *কলকাতা* পত্রিকা (বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা-১৯৭৫), কলকাতার সংবাদ *সাপ্তাহিক দর্পণ*-এর ৭৫-এর পূজা সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এমনকি *কৃত্তিবাস, অনীক, নন্দন, গণশক্তি, বাংলাদেশ, গণবার্তা, জন্মভূমি, পান্থ, মশাল, আত্রেয়ী* প্রভৃতি নানান পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো কবিতা পুরোপুরি বা আংশিক বাতিল হয়েছিল।[২] পাশাপাশি সেই সময় মণীশ ঘটক (১৯২০-১৯৭৯), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২), কমলেশ সেন (১৯৩৭-২০০৬), শঙ্খ ঘোষ (জন্ম- ১৯৩২), সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫-২০১১), মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮-২০১৪), অঞ্জন কর (জন্ম- ১৯৩৯), শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় (জন্ম- ১৯৪৭), দীপক মজুমদার (১৯৩৪-১৯৯৩), পান্নালাল মল্লিক, বিদ্যুৎবরণ চক্রবর্তী, শম্ভু রক্ষিত প্রমুখ কবিদের কবিতাও সেন্সরের আওতায় পড়েছিল। অর্থাৎ এই সকল বিশিষ্ট বাঙালি কবিদের লেখায় এমন রোমহর্ষক কথা লুকিয়ে ছিল যা তৎকালীন শাসকদলের বা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির ভয়ের কারণ হয়েছিল। তাই রাষ্ট্রের আক্রমণ নেমে এসেছিল তাঁদের ওপর এবং সেকারণেই তাঁদের লেখার ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।

তবে বাংলা সাহিত্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও বাংলা সাহিত্য লেখা কিন্তু থেমে থাকেনি। তাই দেখা যায় জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে সেইসময় ও তার পরবর্তীকালে অনেকগুলি উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক,

কবিতা, গান এবং প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, যেগুলির মধ্যে দিয়ে লেখকেরা সেই সময়ের অবস্থাকে তুলে ধরেছিলেন। আর সেইজন্যই জরুরি অবস্থা ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতকে (১৯৭৫-৭৭) কেন্দ্র করে লেখা নির্বাচিত কিছু বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমাদের এই প্রস্তাবনা।

দুই.

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রভাব ফেলছিল। নিষিদ্ধ করা হয়েছিল অনেক উপন্যাস [কৃষ্ণ চক্রবর্তীর *অমানবিক* (১৯৭৭) এবং সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের *নরক* (১৯৮০)]।[৩] গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অনেক ঔপন্যাসিককে। সেইসঙ্গে তাঁদের ওপর চলেছিল অকথ্য অত্যাচার। কারণ জরুরি অবস্থা বা তার আগের দুঃসহ সময়ের ছবি ফুটে উঠেছিল তাদের উপন্যাসে। তাই তাদের ওপর সরকার রুষ্ট হয়েছিলেন। তবে সরকারের এই অসন্তোষ সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাস লেখা হয়েছে, উপন্যাস সেন্সর হয়েছে, আবার নতুন উপন্যাস তৈরিও হয়েছে।

তবে ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থাকে (১৯৭৫-৭৭) কেন্দ্র করে লেখা বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাই সীমিত পরিসরে সমস্ত উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা শুধু অসম্ভবই নয় প্রায় দুঃসাধ্য। তাই আমরা এখানে মূলত ঔপন্যাসিক চাণক্য সেনের (জন্ম-১৯২১) 'ব্রুটাস তুমিও!!' (১৯৮১) উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে জরুরি অবস্থা ও বিপন্ন গণতন্ত্রকে (১৯৭৫-৭৭) খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে ঔপন্যাসিক চাণক্য সেনের জীবন ও সাহিত্য কর্মের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে নেব।

জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা, সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তা, প্রশাসনিক ব্যবস্থার গলদ প্রভৃতিকে যিনি উপন্যাসের বিষয় করেছিলেন তিনি হলেন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক চাণক্য সেন। তাঁর প্রকৃত নাম ভবানী সেনগুপ্ত। অধ্যাপনা, গবেষণা ও সাংবাদিকতা সব ক্ষেত্রেই পারদর্শী এই ঔপন্যাসিক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচ.ডি লাভ করেন। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিখেছিলেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনাতেও তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা অনেকেই জানেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল : *রাজপথ জনপথ* (১৯৬০), *সে নহি সে নহি* (১৯৬২), *মুখ্যমন্ত্রি* (১৯৬৫), *কালের ইতিহাস* (১৯৭২), *ব্রুটাস তুমিও!!* (১৯৮১), *মেরা ভারত মহান* (১৯৯৭) প্রভৃতি।

'*ব্রুটাস তুমিও!!* (১৯৮১) উপন্যাসটি একইসঙ্গে ঔপন্যাসিকের সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় বহন করে। চীনের ভারত আক্রমণ (১৯৬২), ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ এবং ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা জারি (১৯৭৫-এর ২৬ জুন) -- এই প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল। তবে আমরা এখানে মূলত উপন্যাসে বর্ণিত জরুরি অবস্থাকালে ভারতীয় রাজনীতির দৈন্য ও গ্লানিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং জরুরি অবস্থার আসল স্বরূপটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে ভারতের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। জরুরি অবস্থার সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়য়ের অধ্যাপক, গবেষক ও প্রশাসকবৃন্দ কীরূপ ভূমিকা নিয়েছিলেন, পুলিশি আক্রমণের অতিসক্রিয়তা ও অত্যাচারের মাত্রা কেমন ছিল সে বিষয়টি এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা এবার সেদিকেই নজর দেওয়ার চেষ্টা করব।

ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর পুলিশের অতিসক্রিয়তা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের যে অতর্কিত আক্রমণ ঘটেছিল ঔপন্যাসিক চাণক্য সেন তাকে নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং উপন্যাসেও সেই

বাস্তব ঘটনাকে তুলে ধরেছিলেন। তাই উপন্যাসে আমরা দেখি জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির শাসকরা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় দুটিকে 'ঠাণ্ডা' করার সংকল্প নিয়েছিলেন। কারণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ছিল জনসংঘ এবং আর এস এস পার্টি। শুধু তাই নয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুটি পার্টির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অনেক কালের। আর অন্যদিকে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও গবেষকদের মানসিকতা ছিল প্রধানত 'বামপন্থী'। এমনকি তাদের চালচলন, নীতিবোধ, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সবই ছিল বামঘেঁষা। পাঁচটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ষাট শতাংশের সমর্থন দাবি করে। এঁদের মধ্যে সি পি আই এম সবার আগে। তবে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী মানসিকতার আওয়াজ, ঝাঁজ থাকলেও তাতে শাঁস কিছু ছিল না।[৪] এককথায় তাদের 'বামপন্থী' কুচকাওয়াজ শব্দের বিন্যাসের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। তার বাইরে এর কোনো শক্তি নেই। তবু এমারজেন্সি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুলিশকে জনসংঘ, আর এস এস ও সি পি আই এম – এই পরস্পর বিরোধী দলের ওপর আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে একটা উল্লেখযোগ্য তফাৎ রয়ে গিয়েছিল, জনসংঘ নেতা ও কর্মীদের একসঙ্গে শায়েস্তা করা হয়েছিল। কিন্তু সি পি আই এম-এর নেতারা রেহাই পেয়েছিলেন। যদিও রেহাই পাননি কর্মী ও সমর্থকেরা।

উপন্যাসে দেখি, ১৯৭৫ সালের ২৭-এ জুন জে এন ইউ ক্যাম্পাসে সামরিক সাজে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী প্রবেশ করেছিল এমারজেন্সি বিরোধী ছাত্রদের গ্রেপ্তারের জন্য। প্রত্যেক হোস্টেল, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় পাঁচখানা ভ্যান বোঝায় করে আসা সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। তারপর একদল পুলিশ ছেলেদের হোস্টেলের ভিতর প্রবেশ করা মাত্রই ভেসে এসেছিল এক প্রচণ্ড চিৎকার এবং সবাই কয়েক মিনিটের মধ্যে ছুটোছুটি করে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর ছাত্রদের হোস্টেল থেকে পনেরো জন ছাত্রকে পায়জামা পরা অবস্থায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। সেই সঙ্গে আরও দুইজন ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় চ্যাংদোলা করে হোস্টেল থেকে বার করে এনে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের জামাকাপড়ও ছিঁড়ে গিয়েছিল। এইভাবে ৪০ মিনিটের মধ্যে সব নাটক শেষ করে ছাত্রদের নিয়ে একঘণ্টার মধ্যে পুলিশ ক্যাম্পাস ছেড়ে বেড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পাসে ঢোকার মুখে দুটো পুলিশ ভ্যান রেখে গিয়েছিল সশস্ত্র পাহারায়, যাতে কারা ক্যাম্পাসে ঢুকছে বা বেরোচ্ছে তা জানতে পারা যায়। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিশ আক্রমণ ও ছাত্রদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি তাঁর প্রয়োগ করা 'অনুশাসন পর্বে'র প্রভাবকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, এক বিরাট পুলিশ রাজ আত্মপ্রকাশ করেছিল সেইসময়।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিশ আক্রমণ ও ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে তখন যে প্রতিবাদ একেবারে হয়নি তা কিন্তু বলা যাবে না। তাই উপন্যাসে আমরা পাই জে এন ইউ-র অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখ, অধ্যাপক ডাঃ জাহিদ জামাল, অধ্যাপক অনিল শিকদার, অধ্যাপক প্রজাপতি ত্রিবেদী এবং ছাত্রী শ্যামলী সেন প্রমুখ প্রতিবাদী মানুষদের, যারা নিঃস্বার্থভাবে জে এন ইউ-তে পুলিশ আক্রমণ ও জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, ক্যাম্পাসে যখন পুলিশ প্রবেশ করে হোস্টেল থেকে ছাত্রদের নৃশংসভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সেই অত্যাচারের ছবি ক্যামেরায় বন্দি করে রেখেছিলেন অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখ। এরপর পুলিশ চলে গেলে তিনি ও তাঁর স্ত্রী মৈথিলী দেশমুখ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা ভেবে বেড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সঙ্গে পেয়েছিলেন অধ্যাপক ডা. জাহিদ জামাল ও অধ্যাপক অনিল শিকদারকে। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদের জামিনের ব্যবস্থা করতে, আহত ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে এবং

এজন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক কর্তাদের কোনো ব্যক্তিই তাদের সাহায্য করতে রাজি হলেন না। তখন তাঁরা একটি স্টাফ মিটিঙের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তিন জন এবং শ'তিনেক ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর কেউ সেই মিটিঙে আসেননি। সেখানে তাঁরা ক্যাম্পাসে পুলিশ অভিযানের প্রতিবাদ করে একটা প্রস্তাব পেশ করেছিল এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি নিবেদনপত্র পাঠানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই মিটিঙে কোনো শ্লোগান ছিল না। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে ১০ মিনিটের মধ্যে মিটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁরা প্রতিবাদ গড়ে তুলছিল। এমনকি উপাচার্য পর্যন্ত যখন ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনার জন্য কোনো উৎসাহ দেখালেন না উপরন্তু জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করলেন তখন তাঁরাও উপাচার্যকে চ্যালেঞ্জ করে ক্যাম্পাসের ভিতরে মিটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে তাদের এই কাজের ফলাফল যে খুব ভালো হবে না সেকথাও উপাচার্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

যাইহোক, অধ্যাপক রজতপ্রকাশ মিশ্রের সঙ্গে অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখের শেষ কথোপকথনই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে তিনি জরুরি অবস্থার কতটা বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন যে, চোখের সামনে মানুষের গণতন্ত্রকে তিনি লুঠ হয়ে যেতে দিতে পারেন না। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি তাঁর জেল এবং মৃত্যুও হয় তবুও তিনি পরোয়া করেন না। কারণ তখন প্রতিবাদ আরও জোরালো হবে। এইভাবে আমরা এই উপন্যাসে একটি প্রতিবাদী মানুষকে খুঁজে পেয়েছিলাম।

অধ্যাপক প্রজাপতি ত্রিবেদীও ছিলেন জরুরি অবস্থার বিরোধী। যদিও তিনি সরাসরি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেননি। তবুও অধ্যাপক রজতপ্রকাশ মিশ্রকে 'পুলিশম্যান' বলে কটাক্ষ করে এর বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন।

উপন্যাসে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যিনি পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি হলেন শ্যামলী সেন। শ্যামলী সেন ছিলেন জে এন ইউ-র ছাত্রী। উপন্যাসে দেখা যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ধনী, শাসকদল ঘেঁষা এবং অনেক অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত একজন ছাত্র হীরেন সকসেনাকে বিয়ে করে তাঁর দেহকে আহুতি দিয়েছিল একনায়কত্বের দম্ভিত লালসার কাছে। তাই অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখ মৈথিলীকে লেখা চিঠিতে বলেছিল- "আমরা যারা বহু মানুষের আত্মসম্মানের জন্য লড়ছি, তাদের সঙ্গে শ্যামলী সেন যদি ভারতবর্ষের বর্তমান বর্তিকা, এ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে পারে না।"[৫] এটিই ছিল শ্যামলী সেনের স্বরূপ যা অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখ বুঝতে পেরেছিলেন। এককথায় শ্যামলী সেন ছিলেন এক প্রতিবাদী মানুষ। তাই উপন্যাসে দেখা যায় ব্যঙ্গ করে তিনি সেজেগুজে থাকাকে 'অনুশাসন পর্ব' বলেছেন। আর গণতন্ত্রকে বলেছেন 'স্বচ্ছ ও পরিষ্কার' যা সেই সময় হরণ করা হয়েছিল।

জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ উঠেছিল তেমনি সেই প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যও সর্বদা তৎপর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর দলের লোকেরা এবং সঙ্গে ছিল পুলিশবাহিনী। এমনকি এই উপন্যাসেও তার প্রতিফলন দেখি। তাই দেখা যায়, অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখ নিজেকে 'বামপন্থী' বলে পরিচয় দেওয়ায় এবং জরুরি অবস্থা ও ক্যাম্পাসে পুলিশ আক্রমণের প্রতিবাদ করায় ১৯৭৫ সালের ১৬-ই আগস্ট রাত্রি দুটো বেজে পনেরো মিনিটে তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে বাড়িতে সার্চ করে একটি ৩৮ রিভলবার, কিছু কাগজ ও নগদ সাত হাজার টাকা পেয়েছিল পুলিশ। এরপর তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে শুরু হয় অস্বস্তিকর প্রশ্ন। তিনি কোন দলের লোক, সি পি আই এম কিনা ইত্যাদি বিচিত্র রকম। কিন্তু সেইসব অভিযোগ তিনি অস্বীকার করলে তাকে এরপর অন্য ঘরে নিয়ে প্রশ্ন শুরু করেন থানার অফিসার

ইন চার্জ হরিকিষণ গৌর। তাদের অভিযোগ প্রভাস দেশমুখ নাকি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেন এবং ভারতে আর কোনোদিন গণতন্ত্র ফিরে আসবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। এরকম অনেক ধরণের প্রশ্ন চলতে থাকে। কিন্তু অধ্যাপক দেশমুখ তা অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য একটি সুযোগ দেন ও.সি। আর তা হল তাকে জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করে একটি অঙ্গিকার পত্রে সই করতে হবে এবং জরুরি অবস্থার বিরোধী ছাত্রদের নাম বলে দিতে হবে। কিন্তু অধ্যাপক তা মানেননি। তাই তাকে জরুরি অবস্থার পুরো সময় জুড়ে জেলে থাকতে হয়েছিল। এইভাবে একদিকে চাপের কাছে মাথানত না করার ছবি যেমন আমরা দেখতে পেলাম তেমনি অন্যদিকে পুলিশের অতিসক্রিয়তার ছবিও খুঁজে পেলাম।

ছাত্রছাত্রীদের নীরব প্রতিবাদও পুলিশ শক্তহাতে দমন করেছিল। তাই উপন্যাসে দেখি জে এন ইউ-তে ছাত্রছাত্রীদের গ্রেপ্তারের কিছুক্ষণ পরে সকাল আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাজার খানেক ছাত্রছাত্রী হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রদক্ষিণ করেছিল। কিন্তু কারুর মুখে শ্লোগান ছিল না। মিছিল প্রত্যেক অধ্যাপকদের বাড়ির কাছে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেরুবার রাস্তা ধরেছিল। কিন্তু গেটের কাছে যেতেই বাঁধা পেয়েছিল পুলিশের কাছে। ঘোষণা করা হয়েছিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিছিল না ভাঙলে তাঁরা গুলি চালাতে বাধ্য হবে। একথা শুনে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল ক্যাম্পাস থেকে ফিরে যাবার পথ ধরেছিল। তবু লাঠিয়াল পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পিছু হাঁটা ছাত্রদের ওপর। প্রত্যেকটি প্ল্যাকার্ড তাঁরা কেড়ে নিয়েছিল। ছাত্ররা তাতে কোনো বাধা দেয়নি। কিন্তু তবু অনেকে পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হয়েছিল। এইভাবে পুলিশদের এক বিরাট রাজকীয় দম্ভ সেই সময় প্রকাশ পেয়েছিল।

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থার বিরোধীদের পুলিশের গ্রেপ্তার ও অত্যাচারের ভয় দেখানো হয়েছিল। ফলে তখন অনেকেই চাপের কাছে নতিস্বীকার করে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। উপন্যাসের এরকম দুটি চরিত্র হলেন অধ্যাপক মোহনলাল গোতম এবং অনন্তকুমার যোশী। অধ্যাপক মোহনলাল গোতম জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার আগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক জ্বালাময় বক্তৃতা দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসার জন্য। কিন্তু যখনই ২৬-এ জুন জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শেষ রাতে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও বিরোধী দলের অন্যান্য নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তখন মোহনলাল গোতম উড়ো খবর পেয়েছিলেন যে, পুলিশের গ্রেপ্তারি লিস্টে তাঁর নাম আছে। আর একথা শুনে তিনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই ২৭-এ জুন থেকে মোহনলাল অজ্ঞাতবাস নিয়েছিলেন এবং ১৩ দিনের দিন সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিলেন পার্লামেন্ট স্ট্রীটে পি টি আই ভবনে এবং সেখানে জুনিয়ার ম্যানেজারকে তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ পদত্যাগের কথা এক বিবৃতি মারফৎ জানিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। পরের দিন শোনা গিয়েছিল যে অধ্যাপক মোহনলাল গোতম সক্রিয় রাজনীতি পরিত্যাগ করেছেন এবং বাকি জীবন তিনি তাঁর আসল পেশা অধ্যয়ন ও গবেষণা করেই কাটিয়ে দেবেন। এইভাবে পুলিশের গ্রেপ্তার ও অত্যাচারের ভয়ে তিনি জরুরি অবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন।

অধ্যাপক মোহনলাল গোতমের মতো অনন্তকুমার যোশী নিজে গিয়ে রাজনীতি থেকে সরে না দাঁড়ালেও তাঁকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে জরুরি অবস্থাকে মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই উপন্যাসে আমরা দেখি, ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে দুটি প্রবন্ধ লেখার জন্য পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে বিনা বিচারে দীর্ঘ কারাবাস, চাকরির অকালমৃত্যু, উপবাস ও আজীবন দারিদ্র্যের সম্ভাবনা অনন্তকুমারের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তাই সেসময় পরিবারকে ও নিজেকে বাঁচাতে যোশী বেছে নিয়েছিল পুলিশের শর্তকে। তাই ডি এস পি তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য একটি ফর্মে সই করতে বলেছিল, যাতে লেখা ছিল যে, তিনি অঙ্গীকার করছেন যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের দায়িত্বহীন ভাষায় সমালোচনা

ও আক্রমণ তিনি করবেন না এবং সরকার বিরোধী কোনো কাজে অথবা চিন্তায় তিনি লিপ্ত হবেন না। এইভাবে পুলিশের অত্যাচার ও গ্রেপ্তারের ভয়ে অনন্তকুমার যোশী জরুরি অবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করে সেই সময় অনেকে বিশাল প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। এই উপন্যাসেও আমরা দেখি জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়য়ের উপাচার্য, ডীন সুলেইমান কুরেশী এবং অধ্যাপক রজতপ্রকাশ মিশ্র প্রমুখ প্রশাসনিক কর্তারা জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করে এক বিশাল প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন সেই সময়। এককথায় প্রধানমন্ত্রীর চাটুকারিতা তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই অবলম্বন করেছিলেন। তাই উপন্যাসে দেখি, জে এন ইউ-র ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রছাত্রীদের গ্রেপ্তার করায় উপাচার্যের মধ্যে সামান্য হলেও মৃদু প্রতিবাদ এসেছিল কিন্তু স্ত্রীর উপদেশে তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। কারণ তার স্ত্রীর কথায় তখন মৃদু প্রতিবাদ মানেই ছিল 'জেল! অন্তত বরখাস্ত! এককথায় ডিসমিস'।[৬] তাই চোখ বুজে সেই অবস্থাকে মেনে নিতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর কাজকে সমর্থন করতে হবে। স্ত্রীর এই উপদেশকে উপাচার্য স্বাগত জানিয়েছিলেন। এমনকি ছাত্ররা তাঁর গাড়ি আটকে গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদের ছাড়াবার কথা বললে তিনি তাঁদের কোনো আশ্বাস না দিয়ে পুলিশের ভয় দেখিয়েছিলেন।

এইভাবে উপাচার্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির কাজকে সমর্থন করেছিলেন এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের একান্ত পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে এক মিটিঙে মিলিত হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন- 'প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। রাইট রিয়্যাকশনের আক্রমণে আমাদের এত পরিশ্রমে গড়া সমাজবাদী গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তাকে বাঁচাবার জন্যেই প্রধানমন্ত্রীকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে। জরুরী অবস্থায় আমরা বেঁচে থাকবার অধিকার ফিরে পেয়েছি। আমাদের এই সংকট সময়ে দৃঢ়চিত্তে প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়াতে হবে। দেখাতে হবে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র রক্ষায় আমরা কারুর চেয়ে পিছিয়ে নেই'।[৭] এইভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে ক্ষমতার উচ্চ আসন পেতে চেয়েছিলেন উপাচার্য। তবে তিনি শুধুমাত্র এই প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হননি। তাই দেখা যায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলি নিয়মের কথা ঘোষণা করেছিলেন যা ছিল কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। সেগুলি হল-

১. 'আজকের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে ডিসিপ্লিন। চিন্তায়, ভাবনায়, কথা, কাজে আমাদের সর্বক্ষণ ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে।'

২. 'বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের কোনও অংশ থেকে সামান্যতম বিশৃঙ্খলাও সহ্য করা হবে না।'

৩. 'প্রত্যেক শিক্ষককে ঠিক দশটায় নিজ নিজ কাজে যোগ দিতে হবে। পাঁচটার আগে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যেতে পারবেন না, শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক প্রয়োজন ছাড়া।'

৪. 'ক্লাসে শিক্ষকগণ শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যকলাপ নিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিন্দুমাত্র সমালোচনাও আজ থেকে নিষিদ্ধ।'

৫. 'ছাত্র-ছাত্রীদের পুরোপুরি শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে।'

.....

৬. 'পরিশেষে, প্রধানমন্ত্রীকে পুরো সমর্থন জানিয়ে আমি একখানা পত্র পাঠাচ্ছি আপনাদের সবাকার তরফ থেকে। পত্রখানা পড়বার প্রয়োজন নেই। আপনারা সরবে পত্রখানার সমর্থন জানালেই যথেষ্ট।'[৮]

এইভাবে সেইসময় উপাচার্য হয়ে পড়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্ষমতার উৎস। এককথায় এক বিরাট ক্ষমতার দম্ভ আত্মপ্রকাশ করেছিল সে সময়।

জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন সুলেইমান কুরেশীও জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন এবং অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখ, অধ্যাপক জাহিদ জামাল এবং অধ্যাপক অনিল শিকদারদের মতো জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁদের কোনোরকম সাহায্য না করতে অস্বীকার করেছিলেন। এককথায় তাঁর লক্ষ্য ছিল এই সময় কিছু আখের গুছিয়ে নেওয়া এবং সেই সুযোগও তাঁর এসেছিল। আর তা হল লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি-র পদ। অনন্তকুমার যোশী তাঁর নাম সুপারিশও করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সেটি পাননি। তাই তিনি জরুরি অবস্থাকে সমর্থনের মাধ্যমে আলাদাভাবে প্রতিপত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

তবে জরুরি অবস্থায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন অধ্যাপক রজতপ্রকাশ মিশ্র। তিনি সেইসময় স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেসন্‌স- এর 'প্রক্টর' নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল যারা জরুরি অবস্থা ও প্রধানমন্ত্রীর কাজের বিরোধিতা করবে তাঁদের সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠানো। তাই ক্ষমতায় এসেই তিনি শুরু করেছিলেন মিলিটারি শাসন। সেইসঙ্গে তুলে ধরেছিলেন কতগুলি নিয়ম। সেগুলি হল-

১. 'আজ থেকে এই স্কুলে প্রত্যেককে পুরোপুরি শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।'

২. জাতির এই সংকট সময়ে প্রধানমন্ত্রীর আমরা অনুগত বিশ্বস্ত সৈনিক।'

৩. 'সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য নিয়ে রাইট-রিয়্যাকশন আমাদের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে মুখোমুখি আক্রমণ করেছে। জরুরি অবস্থা গণতন্ত্রকে বাঁচিয়েছে। আমাদের দিয়েছে স্বাধীনভাবে ও সসম্মানে বাঁচবার অধিকার।'

৪. 'আজ থেকে আমাদের একমাত্র মন্ত্র : ডিসিপ্লিন।'

৫. 'ছাত্রীরা সংযত বেশ পরিধান করবেন। জীনস পরে ক্লাসে আসা চলবে না। সালোয়ার কামিজের সঙ্গে দোপাট্টা ব্যবহার বাধ্যতামূলক।'

৬. 'ছাত্রদের কেশ রাখা নিষিদ্ধ। যাদের আছে তাঁরা তিন দিনের মধ্যে চুল ছাঁটবেন।'

৭. 'ছাত্ররা শার্টের ও কুর্তার বোতাম বন্ধ রাখবেন।'

৮. 'স্কুল বিল্ডিংয়ে ধূমপান নিষিদ্ধ।'

৯. 'শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গাল-গল্প করবেন না।'

১০. 'তিনজনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী একত্র চলাফেরা করবেন না।'

১১. 'স্কুল বিল্ডিংয়ে রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ, অবশ্য জরুরি অবস্থা ও প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন ছাড়া।'

১২. 'শিক্ষকরা ঠিক দশটায় নিজেদের অফিসে হাজির হবেন। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। শিক্ষকরা হাজিরা খাতায় প্রতিদিন সই করবেন, কখন আসছেন ও কখন যাচ্ছেন তাঁর সময় লিখে দেবেন।'

১৩. 'শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের এমন কোনও পুস্তক পড়তে বলবেন না যা সাবভারসিভ মনোবৃত্তি সৃষ্টি করতে পারে।'[৯]

এইভাবে কতগুলি নিয়ম তৈরি করে অধ্যাপক রজতপ্রকাশ মিশ্র তাঁর স্টেনোকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, এই নোটিস বিল্ডিংয়ের প্রত্যেক তলায় চারখানা করে লাগিয়ে দিতে হবে। তবে, শুধু ছাত্র-ছাত্রী বা অধ্যাপক নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপরও সেই সময় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তাই উপন্যাসে দেখা যায় অধ্যাপক

রজতপ্রকাশ মিশ্র কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' কবিতাটি লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ তখন সেই কবিতাটি সেন্সর করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এই ফ্রেমটিকে সমূলে ধ্বংস করার করার কথাও তাঁর মনে এসেছিল। সুতরাং দেখা গেল যে ক্ষমতার দম্ভ মানুষকে কোন অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। আর এইভাবেই তিনি সেই প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন।

অধ্যাপক মোহনলাল লাল গোতমও প্রধানমন্ত্রীর কাজকে সমর্থন করে সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিংক ট্যাঙ্কে'র কর্ণধার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে জরুরি অবস্থার সুযোগে তাঁরা প্রচুর সুবিধা ভোগ করেছিলেন।

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজনীতি প্রবেশ করেছিল পুরোদমে এবং এই উপন্যাসেও আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পায়। তাই দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে মুখে তখন একটায় আলোচিত বিষয় ছিল 'এমারজেন্সি'। এমনকি তার প্রভাব পড়েছিল গবেষণাপত্রেও। তাই জে এন ইউ-এর এক গবেষক সুমন্ত ঘোষ যখন তার বন্ধু তেজবী সিং-কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তার গবেষনার কাজ কেমন চলছে তখন তার উত্তরে সে জানিয়েছিল যে তা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। কারণ তার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক রজতপ্রকাশ মিশ্র যেহেতু এখন 'প্রক্টর' নিযুক্ত হয়েছেন সেহেতু অধ্যাপক মিশ্রের এখন একটুও সময় নেই। এমনকি তার তিনটি অধ্যায় পুরো শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আবার বদলাতে হবে। কারণ, অধ্যাপক মিশ্র এখন নতুন দৃষ্টিতে আমেরিকাকে দেখতে পাচ্ছেন। অন্যদিকে গবেষক সুমন্ত ঘোষের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। কারণ তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখ। তিনি তখন জেলে এবং তাঁর কাছ থেকে ডিগ্রি পেলে ভবিষ্যতে চাকরি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে তার মনে হয়েছিল। তাই তার বাবার কথা শুনে সে আই-এ-এস পরীক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এইভাবে সেই সময় জে এন ইউ-এর গবেষকদের মধ্যেও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল।

জরুরি অবস্থার সময় দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছিল। যতরকম সমাজ বিরোধীরা ছিল শাসক দলের কাছের লোক। ফলে তাঁরা যা ইচ্ছা তাই করত। উপন্যাসেও এরকম একটি চরিত্র আমরা পাই। তার নাম হীরেন সকসেনা। তিনি ছিলেন জে এন ইউ-র ছাত্র। কিন্তু এটি ছিল তার বাইরের আবরণ মাত্র। তাই শ্যামলী সেনের কাছে আমরা জানতে পারি যে, সকসেনা পরিবারের ছেলে প্রদীপ সরকারের বড় ভাই দিল্লির লেঃ গভর্নর নিযুক্ত হচ্ছেন, হীরেন সকসেনার মেজ ভাই নিউ দিল্লি স্টেডিয়াম তৈরির জন্য ১০ কোটি টাকার সোল কনট্রাক্ট পেয়েছেন এবং হীরেন সকসেনা তিনমাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হবেন। পরে উপাচার্যও জানিয়েছিলেন যে, লোকসভায় হরিয়াণার এক আসন্ন উপনির্বাচনে হীরেন্দ্রনাথ সকসেনা কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন এবং তার জয় একেবারে সুনিশ্চিত। এই ছিল তখনকার অবস্থা। আর এই ধরণের মানুষেরাই দেশ চালাত। ফলে দেশ সন্ত্রাস ও দুর্নীতিতে ভরে উঠেছিল।

জরুরি অবস্থায় মহিলারাও ছিলেন পুরুষদের জেগে ওঠার একমাত্র শক্তি। উপন্যাসে মৈথিলী দেশমুখ ছিলেন এরকমই একটি চরিত্র। তিনি সবসময় তাঁর স্বামী অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখের পাশে থেকেছিলেন এবং জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এমনকি প্রভাস দেশমুখকে ধরে নিয়ে গেলে যখন অনেকে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথা বলেছিলেন তখন মৈথিলি দেশমুখ একাই লড়াই করে আইনের পথে জয়লাভ করেছিলেন এবং তাঁর স্বামীর বেতন না দিলে তিনি উপাচার্যের ঘরের সামনে তাঁর পুত্র কন্যাদের নিয়ে অনশনে বসারও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে এসেছিলেন।

অধ্যাপক মোহনলালের স্ত্রী নীরজাও চেষ্টা করেছিল তাঁর স্বামীকে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলতে। কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মোহনলাল ভয় পেয়ে গিয়ে রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করেছিল এবং পরে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিংক ট্যাঙ্কে'র কর্ণধার হিসাবে যোগ দিয়েছিল। তাই নীরজার মুখ থেকে বেড়িয়ে এসেছিল সেই অসাধারণ উক্তি- 'আহা, বেচারা, তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, আহা বেচারা ফুরিয়ে গেছ তুমি'।[১০]

উপন্যাসের একদম শেষে এসে শ্যামলী সকসেনার হাত দিয়ে মৈথিলী দেশমুখের কাছে পাঠানো অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখের চিঠিটির মধ্যে দিয়ে আমরা উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে যেমন জানতে পারি তেমনি জানতে পারি দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী বিশ্বাসঘাতক চরিত্রদের। পাশাপাশি তাঁর এই চিঠির মধ্যে দিয়ে আমরা অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখের স্বরূপটিও বুঝে নিতে পারি। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রপ্রেমি। তাই কখনোই অনুশাসন বা স্বৈরতন্ত্রকে মেনে নেননি। বরং ঘৃণা করেছেন। তাই বলেছেন-

> মানতে পারি না, শুধু এ জন্য যে বিরাট একটা প্রতারণার মাধ্যমে এটা শুধু আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে এক বৈষম্য জর্জরিত, শোষণ সর্বস্ব অত্যাচারী অবিচার ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্য।[১১]

তিনি দেখেছেন যে, তাঁর চারদিকেই ছড়িয়ে আছে বিশ্বাসঘাতকেরা। আর তাঁদের চেহারা হয়ে উঠেছে ক্রমশ ভয়াল, কদর্য ও বীভৎস। তাই প্রভাস দেশমুখ আক্ষেপ করে বলেছেন-

> সীজর তাঁর কোনও বন্ধু, মিত্র ও অনুগতদের কাছ থেকে ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত দেহেও চমকে ওঠেন নি, কেবল একজন ছাড়া, তাঁর নাম ব্রুটাস। ব্রুটাসের শাণিত ছুরি যখন তাঁর পার্শ্বদেশ ভেদ করল সীজর চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ব্রুটাস, তুমিও!' অর্থাৎ, তোমাকে তো আমি অবিশ্বাস করতে পারিনি, পুরোপুরি নির্ভর করে এসেছি তোমার ওপর, তোমার আনুগত্যকে মনে করেছি সন্দেহের অতীত, সেই তুমিও ব্রুটাস তুমিও! মিথুন আমরা আজ এমন এক অন্ধকারের মধ্যস্থলে উপনীত হয়েছি যখন আমাদের মুখ থেকে বেড়িয়ে আসছে ব্রুটাস তুমিও? আমরা ধরে নিয়েছিলাম, দরিদ্র, অভাব, শোষণ, অবিচার অসাম্য যতোই-না থাকুক আমাদের জীবনে, তবু আমরা কতগুলি মানবিক অধিকারকে পেতে পেরেছি, যা তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই হয় একেবারে পায় নি, নয়তো পেয়েও অল্পকালেই হারিয়েছে। আমরা কোনওদিন ভাবিনি গণতন্ত্রও আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, হঠাৎ ছুরি মারে পার্শ্বদেশে। আমরা কি ভেবেছি আমাদের শিক্ষকগণ একদিন গোয়েন্দাগিরি করবেন আমাদের ওপর? আমাদের উপাচার্যগণ হ'য়ে বসবেন ক্ষমতাবান শাসকদের হাতের পুতুল? আমরা কি ভেবেছি কোনওদিন ভাই ভাইকে মারবে, সন্তান পিতার সঙ্গে শত্রুতা করবে, সহকর্মী বন্ধু কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না? এখন আমরা বিচরণ করছি অনেক অনেক মুখোস-পরা ব্রুটাসদের মধ্যে, আমাদের সতর্কে পা ফেলতে হবে, সাবধানে রক্ষা করতে হবে নিজেদের জীবন, আদর্শ, লক্ষ্য, মূল্যবোধ। মিথুন, আমি স্বৈরাচারকে ঘৃণা করি, ডিকটেটারশিপকে ভয় করি তাঁর প্রধান কারণ একনায়কত্ব আসলে ব্রুটাসদের রাজত্ব, সেখানে কে কাকে কখন কি কারণে ছুরিকাঘাত করবে কেউ জানে না।...ব্রুটাসরা শাণিত ছুরি নিয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে আজকের অন্ধকারে।[১২]

তবু এর মধ্যেও প্রভাস দেশমুখ আশার আলো দেখেছেন। কারণ এই অবস্থাতেও এমন কিছু মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেননি। এরকমই একটি চরিত্র হল শ্যামলী সেন। তাই অধ্যাপক প্রভাস দেশমুখ বলেছেন যে শ্যামলী সেন

তাঁর দেহকে আহুতি দিয়েছিল একনায়ত্বের দম্ভিত লালসার কাছে, কিন্তু যার প্রাণ চলছে, জীবনদায়িনী স্রোতস্বিনীর মত আমাদের সঙ্গে, আমরা যারা বহু মানুষের আত্মসম্মানের জন্য লড়ছি, তাদের সঙ্গে শ্যামলী সেন যদি ভারতবর্ষের বর্তমান বর্তিকা, এ দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে পারে না।[১৩]

এইভাবে ঔপন্যাসিক চাণক্য সেন তাঁর 'ব্রুটাস তুমিও !!' (১৯৮১) এই উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক ও প্রশাসকবৃন্দ কীরূপ ভূমিকা নিয়েছিলেন, পুলিশি আক্রমণের অতিসক্রিয়তা ও অত্যাচারের মাত্রা কেমন ছিল সে বিষয়টি যেমন তুলে ধরছেন ঠিক তেমনি প্রতিবাদী ও বিশ্বাসঘাতক মানুষদের স্বরূপটিকেও অনুপুঙ্খভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

তিন.

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা বাংলা উপন্যাসের পাশাপাশি বাংলা ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলছিল। নিষিদ্ধ করা হয়েছিল অনেকগুলি ছোটোগল্প (উদয় রায়ের 'প্রত্যেক মায়ের সন্তানেরা' ১৯৭৫ সালে সেন্সর হয়েছিল এবং অচিন্ত্য কুমার সাঁতরার বেশ কিছু গল্প ১৯৭৬ সালের ১০ জুন সেন্সর হয়েছিল)। কারণ জরুরি অবস্থা বা তার আগের দুঃসহ সময়ের ছবি ফুটে উঠেছিল সেই সময়ের ছোটোগল্পে। তাই সেই সব লেখকদের ওপর সরকার রুষ্ট হয়েছিলেন। তবে সরকারের এই অসন্তোষ সত্ত্বেও বাংলা ছোটোগল্প লেখা হয়েছে, লেখা সেন্সর হয়েছে, আবার নতুন লেখা তৈরিও হয়েছে।

ছোটোগল্পকার সিদ্ধার্থ ঘোষের 'দুরারোগ্য' গল্পটির মধ্যে দিয়ে জরুরি অবস্থার ভয়ংকর পরিস্থিতি ও বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদকে সমান ঘৃণার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।[১৪] গল্পটি শুরু হয়েছে হরিহর সরকার নামে এক কেরানির অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে কেবলমাত্র পুলিশকে দেখলেই থুতু ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। দেখা যায় আমহার্স্ট স্ট্রীট ও শেয়ালদার মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিশের হোমগার্ডের পায়ের কাছে সে প্রায় প্রতিদিনই থুতু ফেলে যায়। আর একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকায় হরিহরবাবুকে লালবাজার ও বিভাগীয় তদন্তের শেষে এই অজ্ঞাত রোগ নির্ণয় না হওয়ায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে যেতে হয়। গল্প শেষ হয় ১৯৭৭ সালের ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর। সরকারের মন্ত্রীসভার প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পান হরিহরবাবুও। জেল থেকে মুক্তির দিনে হরিহরবাবুর আত্মিয়-পরিজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে মনোচিকিৎসক ডা. সেনও উপস্থিত ছিলেন। হরিহরবাবুকে গ্রেপ্তারের আগে তাঁর রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য পুলিশই নিযুক্ত করেছিল তাকে। সেই ডা. সেন হরিহরের এক সহকর্মীকে বলেন যে, হরিহরের খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে শানুকে পুলিশ নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। সেই দৃশ্যের একমাত্র সাক্ষী হরিহরবাবুর থুতু ফেলার উপসর্গ শুরু হয় ঐ হত্যাকে নিজের চোখে দেখার পর থেকে। গল্পকার জরুরি অবস্থা, পুলিশি নির্যাতন ইত্যাদির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার ঘটনাকেও এক আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন হরিহরের এই আচরণের পুনরাবৃত্তি দেখিয়ে। তাই গল্পকার বলেছেন যে, বামপন্থী সরকারের ক্ষমতাসীন হবার সংবাদ শোনার পরে সবিশেষ উৎসাহ দেখানোর ঠিক দু'মিনিট আঠারো সেকেন্ড পরে ট্যাক্সির খোলা জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে হরিহর সরকার ট্র্যাফিক পুলিশের কালো বুটজুতোর ডগা মেপে ছয় ইঞ্চি ছেড়ে এক ধাবড়া থুতু নিক্ষেপ করলেন। গল্পের ১৯৭৫-৭৭ সালের কালপর্বের ঘটনার মধ্যে দিয়ে গল্পকার এইভাবেই জরুরি অবস্থার ভয়ংকর পরিস্থিতি ও বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদকে সমান ঘৃণা সহকারে তুলে ধরেছেন।[১৫]

চার.

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা যেসকল কবি বা সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখার মধ্যে সবসময় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথায় বেশি করে প্রকাশ পেত। আর তাই তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির রোষের কারণ হয়েছিলেন এবং তাঁর ওপর নেমে এসেছিল গ্রেপ্তার ও অত্যাচার। এ প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন-

> 'কলকাতা' পত্রিকার বিশেষ রাজনীতি সংখ্যা ১৯৭৫-এ 'পিতার পত্র' নিবন্ধটি ছাপতে দেওয়ার অপরাধে গৌরকিশোর ঘোষকে তাঁর বি. টি. রোডের আবাস থেকে ৬ অক্টোবর ১৯৭৫-এ গ্রেপ্তার করা হয়।[১৬]

কারণ, এই নিবন্ধটিতে তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় ভালো বলেছিলেন এবং তাঁর বাড়িতে এককপি *কলকাতা* পাওয়া গিয়েছিল। যদিও তখনও পর্যন্ত পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি। তাই পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিলেও পরে আবার মিসায় গ্রেপ্তার করে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠানো হয়েছিল।[১৭]

গৌরকিশোর ঘোষ ছিলেন একজন দৃঢ় এবং স্বাধীনচেতা মানুষ। তাই 'পিতার পত্র' (*কলকাতা* পত্রিকার প্রথম রাজনীতি সংখ্যা) নিবন্ধটিতে জরুরি অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মনে জমে থাকা গভীর দুঃখের কথা অকপটে ছেলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং ছেলের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখি ছেলে তাঁর বাবা গৌরকিশোর ঘোষকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল- 'বাবা তুমি মাথা মুড়িয়েছ কেন?'[১৮] তখন তাঁর উত্তরে গৌরকিশোর ঘোষ জানিয়েছিলেন-

> .....সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে আমার স্বাধীনভাবে লেখার অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। এখন আমি যেমন চাই তেমন কথা আর লিখে প্রকাশ করতে পারব না। সরকার যেসব কথা শুনতে চাইবেন, শুধু সে-সব কথা লিখতে হবে।.....সরকারের এই কাজকে আমি লেখকের অধিকারের অন্যায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করি। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাবার জন্যই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। যতদিন আমি লেখক হিসাবে আমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরে না পাব ততদিন মাথার চুল গজাতে দেব না।[১৯]

এইভাবে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে লেখার মাধ্যমে প্রতিবাদ করার জন্য গৌরকিশোর ঘোষকে জরুরি অবস্থার গোটা সময় জুড়ে জেলে থাকতে হয়েছিল। তবু তাঁর প্রতিবাদ দমিয়ে রাখা যায়নি। জেলে বসেই তিনি লিখেছিলেন 'কারাগারের চিঠি'[২০] তাই *কলকাতা* পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত বলেছিলেন- 'গৌরকিশোর ঘোষ এমন এক সত্য যাকে গ্রানাইটের স্তূপের তলায় চাপা দিলেও আর নিশ্চিহ্ন করা যাবে না'।[২১] সত্যিই সম্পাদকের এই বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সার্থক। তাই দেখা গিয়েছিল যে গৌরকিশোর ঘোষের উল্লিখিত পত্রসহ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে অন্যান্য রচনা নিয়ে *আমাকে বলতে দাও* নামে গ্রন্থায়িত হয়ে তাঁকে বহুমূল্য ম্যাগসাইসাই পুরস্কার এনে দিয়েছিল।

কলকাতা পত্রিকার দ্বিতীয় রাজনীতি সংখ্যায় (বসন্ত-১৯৭৭) প্রকাশিত গৌরকিশোর ঘোষের 'কোনো এক জিরাফের স্মৃতি ফলকের জন্য'[২২] কবিতাটির মধ্যে দিয়ে তিনি জরুরি অবস্থার সময় কোনো মানুষ যদি স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত প্রকাশ করত তবে তাঁর ওপর যে কঠিন আঘাত নেমে আসত তাকে সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে তুলে ধরেছিলেন। তাই কবিতার শুরুতেই তিনি বলেছেন-

লোকটা বড় আজব ছিল

লোকটা বড় আজাদ ছিল
লোকটা বড় আজব কথা বলত
বলত, 'ভাই মানুষকে শিকল পরিয়ো না
সে ফুল ফোটাবে।'
(গৌরকিশোর ঘোষ: 'স্মৃতি ফলকের জন্য কোনো এক জিরাফের')

আসলে কবি গৌরকিশোর ঘোষ ছিলেন একজন সমাজ দ্রষ্টক। এককথায় প্রত্যক্ষদর্শী। তাই কোনো কিছুই তাঁর চোখ থেকে বাদ যায়নি। সেকারণে তিনি বলেছেন যে, সেইসময় এমন অনেক মানুষ ছিলেন যাদেরকে 'আজব' বলে মনে করা হত। কারণ তাঁরা সবসময় নিজেদের খেয়ালে চলতেন এবং তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো নিয়ম তাঁরা মানতেন না। তাঁরা স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেই ভালোবাসতেন। আর সেজন্য তাঁদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা বলে মনে করা হত। এমনকি তাঁদের কথাবার্তাকেও 'আজব' বা পাগলের প্রলাপ বলে মনে করা হত। কারণ তাঁরা বলতেন যে, মানুষকে শিকল অর্থাৎ নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা উচিত নয় এবং এরাই কল্যাণমুখী কাজের মধ্যে দিয়ে দেশকে ফুলের মত সুন্দর ও সুস্থির করে তুলবে। কিন্তু তাঁদের এই কথা সেই সময় শাসক দলের নেতা বা নেত্রীদের কাছে কোনো গুরুত্ব পায়নি। উপরন্তু তাঁদের কী পরিণতি হয়েছিল সে কথা বোঝাতে গিয়ে কবি বলেছেন-

হাঃ হাঃ সে বড় মজার কথা
মজার কথা
লোকে বলল, 'ওটা মানুষ নয়, জিরাফ'
লোকে ওটাকে চিড়িয়াখানায় ভরে দিল
বন্ধুরা মাঝে মাঝে ওটাকে ঘাস জল দিয়ে আসে
আহা, ওটাকে তারা কত ভালবাসে !
(গৌরকিশোর ঘোষ: 'কোনো এক জিরাফের স্মৃতি ফলকের জন্য')

কালের নিয়মে এইসব স্বাধীনচেতা মানুষদের জীবনে পরবর্তীকালে যে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে তা কবি জানতেন। কারণ শত চেষ্টাতেও এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই কবি বলেছেন যে, সেইসব স্বাধীনচেতা মানুষদের কথা শুনে তৎকালীন শাসক দল এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁদের আর বাইরে না রেখে সোজা জেলে পুরে দিয়েছেলেন। ঠিক জিরাফের মত পশুদের যেমন চিড়িয়াখানায় ভরে দেওয়া হয় সেইরকম। এইভাবে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, স্বাধীন ও উন্মুক্ত মনের অধিকারী প্রতিবারেই তাঁদের ওপর অত্যাচার নেমে এসেছে এবং গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দী করা হয়েছে। এককথায় নেতৃত্ব ও ক্ষমতায় টিকে থাকার লোভ তাঁদের এই ধরণের কাজ করতে বাধ্য করিয়েছে। আর সেটাই কবি এখানে ব্যঙ্গের ছলে বলতে চেয়েছেন।

পাঁচ.

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা বাংলা কবিতা, উপন্যাস ও বাংলা ছোটোগল্পের পাশাপাশি বাংলা নাটকের ওপরেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলছিল। আক্রান্ত হয়েছিল অনেকগুলি নাটক [অমল রায়ের *নিজবাসভূমে* (*শারদীয় দেশপ্রেমিক*, ১৯৮২), *লাসবিপণি* (১৯৭৪), *দিন আসবেই, রক্তের জোয়ারে শুনি, হে রাজবিদ্রোহী* প্রভৃতি]। পাশাপাশি সেই সময় নাট্যকারদের ওপরেও অত্যাচার চালানো হয়েছিল। কারণ জরুরি অবস্থা বা তার আগের দুঃসহ সময়ের ছবি ফুটে উঠেছিল সেই সময়ের নাটকে। তবে সরকারের এই অত্যাচার সত্ত্বেও বাংলা নাটক লেখা হয়েছে, অভিনয় হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে আবার নতুন নাটক তৈরিও হয়েছে।

জরুরি অবস্থা নিয়ে যে কয়েকজন নাট্যকার নাটক লিখেছিলেন উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মূলত গণনাট্যের বিপ্লবী ভাবনা নিয়েই নাট্যসাহিত্য ও নাট্য অভিনয়ের জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি চেয়েছিলেন নাটকের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের বদল ঘটাতে। ফলে তাঁর নাটকে বাস্তবতা এসেছে তীক্ষ্ণভাবে। তাই তাঁর নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যেও রুক্ষতা ও রূঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। আর সেকারণে তাঁর নাটকের সংলাপও তীক্ষ্ণ এবং পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কও গভীরভাবে যুক্ত।

নাট্যকার উৎপল দত্তের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল- *বর্গী এলো দেশে* (১৯৭০), *টিনের তলোয়ার* (১৯৭১), *সূর্যশিকার* (১৯৭১), *ব্যারিকেড* (১৯৭২), *টোটা* (১৯৭৩), *দুঃস্বপ্নের নগরী* (১৯৭৪), *লেনিন কোথায়?* (১৯৭৬), *এবার রাজার পালা* (১৯৭৭), *তিতুমীর* (১৯৭৮), *স্তালিন—১৯৩৪* (প্রথম অভিনয় রজনী- ১৭.১২.১৯৭৯) ইত্যাদি।

নাট্যকার উৎপল দত্ত পিপলস থিয়েটার নামে একটি রাজনৈতিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি লিটল থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি নাটক লিখেছিলেন এবং জীবন্ত মানুষের সংগ্রামের কাহিনিতে সে নাটক ভরপুর ছিল। এককথায় তিনি লিখেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নাটক। তবে তিনি কেবলমাত্র সমকালীন ঘটনার বর্ণনায় নাটকে তুলে ধরেননি সেইসঙ্গে সমাজদ্বন্দ্বের চেহারাটাকে কাটিয়ে তুলে শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষের কাহিনিকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক নাটকের বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, তিতুমীরের লড়াই, ভারতীয় নৌসেনাদের লড়াই, সতীদাহ প্রথা, জালিয়ানওয়ালাবাগের কাণ্ড, জরুরি অবস্থা প্রভৃতিকে।

প্রতিটি নাটকেই নাট্যকার দেখিয়েছিলেন মানুষের মুক্তির লড়াই-এর কাহিনি। কেননা তিনি মনে করতেন যে, সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ সেই সমাজজীবনে ছিল রুদ্ধ। মুক্তিকামী মানুসেরা সংঘবদ্ধভাবে সেই অবরোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। তাই তাঁর নাটকে বারবার এসেছিল সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ।

এবারে আমরা জরুরি অবস্থার শেষদিকে লেখা এবং অভিনীত উৎপল দত্তের 'এবার রাজার পালা' (১ম অভিনয়-৬ জানুয়ারি, ১৯৭৭, কলামন্দির, প্রথম প্রকাশ-জুন, ১৯৭৭, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ) নাটকটি নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করব। সেইসঙ্গে এই নাটকে জরুরি অবস্থার প্রভাব এবং তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকেও খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব। এই নাটক সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন-

> সেই অন্ধকার আর আতঙ্কের দিনগুলিতে জীবন যখন একেবারেই সঙ্কুচিত, সীমাহীন ত্রাসের সেই রাজত্বে পূর্বভারতের বুদ্ধিজীবীরাও যখন বিশেষ কিছুই করছেন না, তখন দাসত্ব আর স্বৈরাচারের দিগন্তে স্বাধীনভাবে তিমিরবিদারী ঊষালগ্ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন উৎপল। সেই শেষ আঘাত হানার সময়ে অস্ত্র নির্বাচনে একটুও ভুল হয়নি তাঁর। 'এবার রাজার পালা' রাজনৈতিক স্যাটায়ার। হিট্‌লারের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ব্রেখ্‌ট্ লিখেছিলেন 'Der

Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui' (দ্য রেসিসটিব্‌ল্‌ রাইজ অফ আর্টুরো উই)। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রী সমুত্থান রূপকে বিধৃত হল 'এবার রাজার পালা' নাটকে। ফলে ১৯৭৭-এর ভারতবর্ষ হয়ে উঠল ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসে উত্তর বাংলার মেচগীর রাজ্যের পীঠস্থান গ্রাম।[২৩]

সমালোচকের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে এবারে আমরা এই নাটকটির আলোচনায় প্রবেশ করব।

নাটকটি শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর বাংলার মেচগীর রাজ্যের পীঠস্থান গ্রামের কংসবধ পালার মহড়া চলার মধ্যে দিয়ে। আর সেই পালার চরিত্ররা হলেন- বঙ্কু বা বঙ্গেশ্বর সিংহ, ননী অধিকারী, চন্দ্র, ঝগড়ু, যমুনা, ভীষ্ম প্রমুখ। পরে এই বঙ্কুই গোপিকাপুরের মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর জারজ সন্তান হিসাবে রাজা হয়েছিলেন এবং ক্ষমতায় এসে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে জরুরি অবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। তাই নাটকের শেষে রাজ্যের সেইসব সাধারণ মানুষেরাই তাঁকে হত্যা করে ত্রিদিব সিংহকে রাজারূপে বরণ করেছিল। ফলে রাজ্যের মানুষ আবার তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছিল। এইভাবে পুরো নাটকটির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থার প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তবে কিভাবে সেটিই এবারে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

জরুরি অবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি সারা দেশে ২০ দফা কর্মসূচি জারি করেছিলেন, যা ছিল কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। নাট্যকার উৎপল দত্ত এই ঘোষণাকে নিজের কানে শুনেছিলেন এবং তাঁকে বাস্তবে রূপ দিতে দেখেছিলেন। তাই এই নাটকেও সেই ঘটনার উল্লেখ আছে। নাটকে দেখি বঙ্কু গোপিকাপুরের রাজা হওয়ার পরে ৭২ দফা কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলিকে ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁকে কঠোরভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেগুলি হল-

- 'কাজ ছাড়া এখন কিছু নয়। কথা বন্ধ করে কাজ করতে হবে, মেচগীরকে ভারতের সবচেয়ে অগ্রসর রাজ্য করতে হবে।'
- 'আজ থেকে সবাইকে দূরে দৃষ্টি দিতে হবে, কাছে নয়। আগামী ছ'মাস যদি খেতে না পান, তো সেদিকে তাকাবেন না, তাকান ছ'বছর পরের সমৃদ্ধ মেচগীরের দিকে।'
- 'গোপিকাপুরের পথঘাটে কাঙালি ভোজনের.....দুটো করে লাইন করতে হবে, একটা ছেলেদের, একটা মেয়েদের- তাহলে ধাক্কাধাক্কি আর হবে না।'
- 'গণ নির্বীর্যকরণ' করতে হবে।'[২৪]

বঙ্কুর এই কর্মসূচি গুলিই আমাদের মনে করিয়ে দেয় জরুরি অবস্থার সময়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির ২০ দফা কর্মসূচির কথা, যা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে হরণ করেছিল।

জরুরি অবস্থার সময় ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা নেমে এসেছিল। সরকার বিরোধী কোনো খবর ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল। এই নাটকেও আমরা এই ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাই। নাটকে দেখি, বঙ্কু গোপিকাপুরের রাজা হওয়ার পর সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কারণ *উত্তরবঙ্গ* পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'বেশ্যার জন্য ত্রিদিব সিংহ গ্রেপ্তার! নূতন রাজার লাম্পট্য কাহিনী!'[২৫] এই শিরোনাম। শুধু তাই নয় এই পত্রিকায় তাঁর ১৪-টি বক্তৃতার মাত্র ছয় লাইন ছাপা হয়েছিল আর মাসুল চোর জন্মদাসী প্রথম পাতা জুড়ে তাঁর কলঙ্কের কথা লিখেছিল- যা ছিল মহারাজ বঙ্গেশ্বর সিংহের (বঙ্কু) বিরোধী। তাই তিনি প্রচার সচিব দোলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আজ থেকে রাজ্যের প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রত্যেকটা খবর তিনি আগে নিজে পড়বেন এবং তারপর ছাপা হবে। তিনি আরও জানিয়েছিলেন 'যদি দেখেন আবহাওয়ার খবরে লেখা

রয়েছে- ঝড় আসছে কেটে ওড়াবেন, কারণ ওটা আজকের রাজনৈতিক অবস্থায় নিরাপদ কথা নয়'।[২৬] এইভাবে সংবাদপত্রের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তাই হর রাজা বঙ্কুর চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দেওয়ার কথা বললে তিনি জানিয়েছিলেন যে, একাজ তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কারণ সংবাদপত্র সেন্সর করা হয়েছে। নাটকের পঞ্চম অঙ্কেও আমরা এই সংবাদপত্রের ওপর সেন্সর আরোপ করার ঘটনাটিকে আরও একবার খুঁজে পাই। তাই দেখি ননী অধিকারী যখন প্রাসাদে বসে সকালবেলায় 'উত্তরবঙ্গ পত্রিকা'-টি পড়ছিলেন তখন সেই পুরো কাগজটিই ছিল একদম সাদা, কেবলমাত্র 'উত্তরবঙ্গ পত্রিকা' এই শিরোনামটি ছাড়া। কারণ প্রচার সচিব দোলের কাছে সমস্ত সংবাদই মনে হয়েছিল রাজাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। তাই সমস্ত খবরই তিনি সেন্সর করেছিলেন। এমনকি ফুটবলের খবরও তিনি ছাপতে পারেননি। কারণ, ঐ টিমের ক্যাপ্টেনের নাম ছিল বঙ্কিম ঘোষ এবং ডাক নাম ছিল বঙ্কু। তাই ননী অধিকারী তাঁকে রাজা বঙ্কুর জীবনের কথা পাতার পর পাতা বানিয়ে লিখে যেতে বলেছিলেন। সংবাদপত্রের ওপর এই নিষেধাজ্ঞার কথা শুনেই আমরা জরুরি অবস্থার সময়কার পরিস্থিতিটি বুঝে নিতে পারি।

জরুরি অবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি শ্রমিকদের বোনাস বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং তার দাবিতে শ্রমিকদের ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। নাট্যকার উৎপল দত্তের এই নাটকেও আমরা এই ঘটনাকে খুঁজে পাই। তাই নাটকে দেখি রাজা বঙ্কু পাঁচ বছরের জন্য প্রজাদের কাছে বোনাস বন্ধের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। কিন্তু প্রজারা তা মেনে না নিয়ে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা ছিল সরকার বিরোধী। তাই বঙ্কু তাঁদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য বর্মনকে পুলিশ নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এই ঘটনা থেকেই আমরা জরুরি অবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির স্বরূপটিকে বুঝে নিতে পারি।

জরুরি অবস্থার সময় দেশের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে হরণ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল হিটলারি শাসন। এই নাটকেও আমরা এই ধরণের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। তাই নাটকে দেখি, রাজা বঙ্কুর বোনাস বন্ধের প্রস্তাব প্রজারা ভোটের মাধ্যমে বাতিল করে দিলে বঙ্কু অন্য পথ অবলম্বন করেছিল। কারণ যেহেতু এই প্রস্তাবটিতে বঙ্কুর পক্ষে ৪০-টি এবং বিপক্ষে ১০৩-টি ভোট পড়েছিল সেহেতু বঙ্কু ঘোষণা করেছিলেন যে এবার থেকে যে কম ভোট পাবে সেই জিতবে। এইভাবে তিনি গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন এবং বিরোধীদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ক্ষমতার দম্ভে তিনি বলেছিলেন- 'গণতন্ত্র মানে আমি যা বলব সবাই মিলে তাই করবে। সেটাই প্রকৃত গণতন্ত্র'।[২৭] তাই বঙ্কু নির্দেশ দিয়েছিল যে চল্লিশটা কাগজে 'হ্যাঁ' লিখতে হবে এবং চল্লিশ জন সদস্য সেই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ভোট দেবে। এইভাবেই তিনি বোনাস বন্ধের পক্ষে ভোট আদায় করেছিলেন এবং নিজের তৈরি আইনকেই গণতন্ত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। আর রাজা বঙ্কুর এই নির্দেশ আদেশই আমাদের জরুরি অবস্থার সময়কার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির কথা মনে করিয়ে দেয়।

জরুরি অবস্থায় সময় ভারতবর্ষে যেকোনো ব্যক্তিকে যে কোনো সময় গ্রেপ্তারের জন্য 'মিসা' আইন চালু করা হয়েছিল। গ্রেপ্তারের পরে তাঁদের ওপর যেকোনো অপরাধ চাপিয়ে দেওয়া হতো। উৎপল দত্তের এই নাটকেও আমরা এই কালো আইনটাকে চালু হতে দেখেছিলাম। তাই নাটকে দেখি, রাজা বঙ্কু বোনাস বন্ধের বিরুদ্ধে যে ১০৩ জন প্রজা ভোট দিয়েছিল তাঁদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হর এর কারণ জানতে চাইলে রাজা বঙ্কু জানিয়েছিল- 'অপরাধটা বুঝলেন পরে ভেবেচিন্তে তৈরী করা যাবে- খুন, রাহাজানি, নারীহরণ- লাগসই কিছু একটা বসে ঠিক করা যাবে'খন-। আপাতত গণতন্ত্র রক্ষা করে নিই।'[২৮] এইভাবে সংবিধানকে

অস্বীকার করে, তাকে জোর করে সংশোধন করে সাধারণ মানুষের গণতন্ত্রকে হত্যার খেলায় মেতে উঠেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি, যা নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি দেশের গণতন্ত্র ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি দেশের মানুষের ওপরই অত্যাচার করেছিলেন। এই নাটকেও দেখি রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য রাজা বঙ্কু হরকে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে গুলি মেরে আহত করে সেই অবস্থাটি দেখিয়ে রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন।

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থার সময় আদালতের ক্ষমতাকেও প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল। আদালত চলত শাসকদলের কথায়। সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার ছিল না। নতুন করে আইন জারি করে আদালতের সব কিছু তাঁদের স্বার্থে পরিচালিত হত। এইভাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির এক বিরাট ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ পেয়েছিল সেই সময়। এই নাটকেও রাজা বঙ্কুর মধ্যে আমরা সেই ক্ষমতার দম্ভের পরিচয় পাই। তাই দেখি, বিচারপতি পরমহংস পঞ্চম পাতকীর ১০৩ জন বিরোধীদের মধ্যে ২৮ জন বিরোধীকে ছেড়ে দেওয়ার খবর চন্দ্র যখন রাজা বঙ্কুকে জানিয়েছিল তখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন-

> আজ থেকে আদালত থাকবে, কিন্তু তার কোনো ক্ষমতা থাকবে না।..... আমরা যা করব তার বিরুদ্ধে কড়ে আঙুলটি তুললে জজের জেল হবে।[২৯]

জরুরি অবস্থাতেও ঠিক এই ঘটনায় ঘটেছিল। তাই নাট্যকার উৎপল দত্তও তাঁর এই নাটকের মধ্যে দিয়ে সেই অবস্থাকে তুলে ধরেছিলেন।

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থার সময় সরকারি চাকুরীজীবীদের ছুটি ছিল নিষিদ্ধ। একমাত্র কাজই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই নাটকে দেখি হর রাজা বঙ্কুর কাছে ২৫ বছরের বিবাহবার্ষিকী করার জন্য ছুটি চাইলে তা নাকচ হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাঁকে এখন ছুটি দিলে সেটাই রীতি হয়ে যাবে এবং ৫০ বৎসর পূর্তির দিনে ফের এসে সে ছুটি চাইবে। এইভাবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করা হয়েছিল সেইসময়।

জরুরি অবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির মনে তাঁর দলের লোকেদের প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জমে উঠেছিল। তাই দেখা যায়, সঞ্জয় গান্ধি ছাড়া তিনি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারেননি। এই নাটকেও সেই ছবি আমরা দেখতে পাই। নাটকে দেখি, গোপিকাপুর রেডিও স্টেশনের ভিতরে কাঁচ ঢাকা সম্প্রচার কক্ষের সামনে ট্যাংরা নামে একটি লোক হর, দোল, ননী, চন্দ্র প্রত্যেকের খানা তল্লাসি শুরু করেছিল এবং জানিয়েছিল যে সেটিই রাজার হুকুম। অর্থাৎ রাজা বঙ্কু তাঁর দলের লোকেদেরও বিশ্বাস করতে পারেননি। কারণ রাজা বঙ্কুর মনে হয়েছিল যে, তাঁর দলের লোকেরাও তাঁর ক্ষতি করে দিতে পারে। আর নিজের লোকের প্রতি এই অবিশ্বাসই তাঁর পতন ডেকে এনেছিল।

জরুরি অবস্থার যারা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের ওপর নেমে এসেছিল শাসক দলের অত্যাচার। এমনকি তাঁদের অনেককে হত্যাও করা হয়েছিল। এই নাটকেও আমরা সেই নৃশংস অত্যাচারের ছবি পাই। তাই নাটকে দেখি, শ্রমিকদের নেতা ভীষ্মের স্ত্রী আন্নাকালীকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল ট্যাংরা ও বর্মনের সঙিনের আঘাতে। পরে ট্যাংরার ওপরেও একইভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল। আবার চন্দ্রও রাজা বঙ্কুর কাজের বিরোধিতা করে রেডিওতে গান করায় তাঁকেও হত্যা করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে শ্রমিক বা কমিউনিস্টদের ওপর রাজা বঙ্কুর নির্দেশে পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালানোর কথাও তুলে ধরা হয়েছিল এই নাটকে।

ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা যে, সাধারণ মানুষকে নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল তাঁর বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম। আমরা দেখেছিলাম যে, সেই সময় সারা দেশ জেলখানায় পরিণত হয়েছিল এবং সমস্ত

রকম অধিকার থেকে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়েছিল। দেশের এই করুণ অবস্থাকে নাট্যকার উৎপল দত্ত খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। এই নাটকেও সেই ঘটনার ছবি ফুটে উঠেছিল। তাই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে আমরা দেখি রাজা বঙ্কু গোপিকাপুর সেন্ট্রাল জেলের উদ্বোধন করতে এসে জরুরি অবস্থার আসল স্বরূপটিকে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন-

> এই নূতন কারাগারে ১৮,০০০ বন্দী সুখে বাস করতে পারবে। এই জেল মেচগীর রাজ্যের বিস্ময়কর অগ্রগতির সাম্প-সাম্প-সাম্প্রতিকতম নিদর্শন। এ দেশের প্রতীক হওয়া উচিত জেল।....আমরা জরুরি অবস্থা জারি করে বলেছিলাম, পুরো রাজ্যকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। জেল হচ্ছে সেই যেখানে এই শৃঙ্খলা সুচারুভাবে পালিত হয়। সহস্র সহস্র সুখী সমৃদ্ধ কয়েদি এক সঙ্গে স্নান করে, এক সঙ্গে খায় তারপর এক সঙ্গে হাসিমুখে উদায়স্ত খাতে, বোনাস চায় না, মাইনেই চায় না তায় বোনাস এবং প্রহরীর লাঠিকে শ্রদ্ধাসহ অবনতমস্তকে মেনে নেয়। উপরন্তু কয়েদিদের যৌনজীবন নেই, সুতরাং তারা সন্তানের জন্ম দিতে পারে না, সুতরাং বলা যায় পরিবার-পরিকল্পনা একমাত্র জেলখানাতেই সম্পূর্ণভাবে সফল ও সার্থক। বন্ধুগণ, কয়েদিরা আদর্শ নাগরিক। ওদের কাছে নিয়মানুবর্তিতা শিখুন, ওদের মতন হয়ে উঠুন। কয়েদিরা কখনো স্ট্রাইক করে না। এ পুরো রাজেটাকে জেলখানার অনুকরণে ঢেলে সাজান। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, সবাই যেন একদিন জেলে আসতে পারেন। তাহলে আমরা একদিন গর্ব করে বলতে পারব, পুরো দেশটা একটা জেলখানার মতন সুশৃঙ্খল, কর্মঠ ও প্রতিবাদহীন। আমি ভেবে দেখছি যে সমাজতন্ত্র আমি চাই তা শুধু জেলখানাতেই সম্ভব। আসুন এ দেশটাকে কারাগার বানাবার সাধনায় ব্রতী হই।[৩০]

রাজা বঙ্কুর এই বক্তৃতা শুনে মনে হয় এ যেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির নিজেরই কথা। কারণ তিনিও এই ধরণের কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে বাস্তবরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এককথায় রাজা বঙ্কু চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার উৎপল দত্ত আসলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির মুখোসটি সাধারণ মানুষের সামনে খুলে দিতে চেয়েছিলেন। আর সেকারণেই তিনি নাটকে এই ধরণের সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন।

জরুরি অবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির দলের অনেকেই তাঁর কাজের বিরোধিতা করেছিলেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আন্দোলনে নেমে এই অবস্থার অবসান চেয়েছিলেন। এই নাটকেও দেখি গোপিকাপুরের রাজা বঙ্কুর জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর দলের লোকেরাই গোপনে আঁতাত গড়ে তুলেছিল রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে। তাঁরা একান্তভাবে চেয়েছিল এই অবস্থার অবসান ঘটুক, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসুক এবং মানুষ ফিরে পাক তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকারকে, কিন্তু তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। তাই নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় ননী অধিকারী, দোল, ত্রিদিব, চামারিয়া, যমুনা, হর, বর্মন এঁরা সবাই শ্রমিক নেতা ভীষ্মর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে রাজা বঙ্কুকে হত্যা করে যখনই বিজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রাসাদ বিদ্রোহে কেবল শাসকের বদল হলো, মহারাজ বঙ্কুর স্থলাভিষিক্ত হলো আরেক অত্যাচারী জমিদার ত্রিদিব সিংহ। চিরকালের শোষিত নির্যাতিত সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষেরা ভীষ্ম আর ওসমানরা আবার ফিরে যেতে বাধ্য হলো শোষণ বঞ্চনার জায়গাতেই। তাই দেখি নাটকের শেষ সংলাপে বানিয়া কিশোরী লাল চামারিয়া জানায়- "এইভাবে মেচগীর রাজ্যে চামারিয়া এন্ড কোম্পানি লিমিটেড লৌহখনি খুঁড়বার অনুমতি পেল"।[৩১]

১৯৪৬ সালের ভারতবর্ষের এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের প্রেক্ষাপট এ নাটকটি লেখা হলেও নাট্যকার দত্ত তাঁর আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় সমকালের জটিল রাজনৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে সহজ ও সাবলীল নাট্য সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। গণতন্ত্র রক্ষার নামে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, আবার

সেই স্বৈরশাসক রাজাকে ভূতপূর্ব রাজার জারজ সন্তান হিসেবে পরিচয় দিয়ে নাট্যকার পরোক্ষভাবে সমকালের স্বৈরচারী শাসকগোষ্ঠী যারা নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে জারজ সন্তান হিসেবে চিহ্নিত করে গণমানুষের ঘৃণাকেই প্রকাশ করেছেন।

এইভাবে নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর *এবার রাজার পালা* নাটকটির মধ্যে দিয়ে জরুরি অবস্থার সময়ের সন্ত্রাসের ছবিকে যেমন একদিকে তুলে ধরেছিলেন তেমনি অন্যদিকে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকে খুব সুন্দর ও বাস্তবসম্মত ভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। আর এখানেই আমরা যেকোনো রকম অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানানোর স্বরূপটিকে বুঝে নিতে পারি।

ছয়.

সুতরাং দেখা গেল, দেশের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনেই যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন সেকথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আসলে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা হারানোর লোভ ও তাতে টিকে থাকাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। আর সে জন্য তিনি যেকোনও রকম পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতেও তিনি দ্বিতীয়বার ভাবেননি। আসলে তিনি চেয়েছিলেন এমন এক রাষ্ট্র যেখানে তাঁর কাজের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ থাকবে না, আন্দোলন থাকবে না, মানুষ সব কিছুকে মেনে নেবে ও মানিয়ে নিবে। কিন্তু কালের নিয়মে তা হওয়ার নয়। তাই ২১ মাস পরেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই ২১ মাসেই তিনি ভারতবাসীর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন তা আজও গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের মনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

যাইহোক, কালের নিয়মে এই জরুরি অবস্থা হয়তো উঠে গিয়েছে, সমাপ্তি ঘটেছে সাতের দশকের উত্তাল অবস্থার, ফিরে এসেছে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন, মানুষ ফিরে পেয়েছে তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকারকে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে। কিন্তু এই স্মৃতি একেবারে মুছে যায়নি। তাই আজও নানান রঙের শাসকের নানা ধরণের আগ্রাসন, নানা রূপের 'সেন্সরশিপ' আমাদের চারপাশে চোখে পড়ে। হয়ত অন্যরূপে, অন্যভাবে। আর এটাই আমাদের 'ট্র্যাডিশন'। তবু লেখার মাধ্যমেই গড়ে উঠুক কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিবাদী মানসিকতা এটাই সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষ হিসাবে আমাদের একমাত্র কাম্য।

তথ্যসূত্র

১. বসু, নিমাইসাধন, *আমি: ইন্দিরা গান্ধী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃষ্ঠা. ৪০

২. দত্ত, সন্দীপ, 'ভারতীয় সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস', তাপস চক্রবর্তী সম্পাদিত *ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ* (সংযোজিত ও পুনর্মুদ্রিত), গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর), কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ৩৪ (পরিশিষ্ট-৯)

৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৪ (পরিশিষ্ট-৯)

৪. সেন, চাণক্য, *ব্রুটাস তুমিও!!*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল, ১৯৮১, পৃষ্ঠা. ৩৫

৫. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৪৩

৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪০

৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৯

৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৯-৫০

৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ৫১-৫২

১০. ঐ, পৃষ্ঠা. ৯০

১১. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৪১

১২. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৪১-১৪৩

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা. ১৪৩

১৪. দাস, অরূপকুমার, *ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা. ২৯৫

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৯৬

১৬. ঘোষ, গৌরকিশোর, 'কারাগারের চিঠি', জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার দ্বিতীয় রাজনীতি সংখ্যা (বসন্ত- ১৯৭৭), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ঘ

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ঘ

১৮. ঘোষ, গৌরকিশোর, 'পিতার পত্র', জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার দ্বিতীয় রাজনীতি সংখ্যা (বসন্ত- ১৯৭৭), ,প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ৪৩

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৩

২০. ঘোষ, গৌরকিশোর, 'কারাগারের চিঠি', জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার দ্বিতীয় রাজনীতি সংখ্যা (বসন্ত- ১৯৭৭), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ঘ

২১. দত্ত, জ্যোতির্ময়, 'সম্পাদকের সংযোজন', জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার দ্বিতীয় রাজনীতি সংখ্যা (বসন্ত- ১৯৭৭), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. ছ

২২. ঘোষ, গৌরকিশোর, 'কোনো এক জিরাফের স্মৃতি ফলকের জন্য', জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত *কলকাতা* পত্রিকার দ্বিতীয় রাজনীতি সংখ্যা (বসন্ত- ১৯৭৭), প্রতিভাস ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা. গ

২৩. দত্ত, সৌমেন, 'নাটক পরিচিতি', উৎপল দত্ত, 'নাটকসমগ্র' (ষষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ভাদ্র, ১৪০, পৃষ্ঠা. ৬৫৫-৬৫৬

২৪. দত্ত, উৎপল, *এবার রাজার পালা,* 'নাটকসমগ্র' (ষষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ভাদ্র, ১৪০, পৃষ্ঠা. ২৬০

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৬২

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৬৩

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৬৪

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৬৫

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৭৪

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৭৭-২৭৮

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৯৪